জে. এল. আর. ও. কড়চা

তথাগত

কালিন্দ্রী প্রকাশনী
আরাপুর, মালদহ

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী আলপনা ঘোষ
কালিন্দ্রী প্রকাশনী
আরাপুর, মালদহ

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ, ১৩৭২

পরিবেশক :
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
নচিকেতা ঘোষ

মুদ্রক :
শ্রীশীতল চক্রবর্তী
শ্রীনারায়ণ প্রিন্টার্স
৩/১ বি, মোহনবাগান লেন
কলকাতা-৪

সেই সব জে. এল. আর. ও.-দের উদ্দেশে যাঁরা এই
ঘটনাবলীর বিরোধিতার সৎসাহস আজও রাখেন—

এই গ্রন্থের ঘটনা ও চরিত্রাবলী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তবে যদি কোন বাস্তব চরিত্রের সঙ্গে এর মিল থাকে তবে তা একেবারেই আকস্মিক। এই প্রসঙ্গে বলি যে প্রথম কটি ফর্মায় C. I-এর পরিবর্তে C-৭ ছাপা হয়েছে। এই ত্রুটি মার্জনীয়।

তথাগত

১

—আমাদের দুঃখটা কোথায় হয়তো জানেন না নিলয়দা !

—দুঃখ নেই, এমন লোক আছে নাকি !

নিলয় চিন্তা করলো, উষা তার পারিবারিক নিত্য-নৈমিত্যিক দুঃখের কথাটাই হয়তো বলছে ; কিন্তু নিলয় হয়তো এখন জানে না, উষা কত চাপা, কত গম্ভীর। নিলয়ের মনের ভাবটা বুঝে উষা বলল—

—আপনি হয়তো ভাবছেন, আমি আমার সংসার সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইছি, কিন্তু তা নয়।

—তবে ?

—আমি বলছি, আমাদের জাতি অর্থাৎ নারী জীবনের দুঃখ ও সমস্যার কথা।

নিলয় হাসতে হাসতে বলল—

—হয়তো একদিন ছিল, এখন আর নেই।

—নেই কি করে জানলেন ?

—যুগের পরিবর্তন। তার সঙ্গে সরকারের সাপোর্ট। এখন তোমাদের নিয়ে আমরাই সমস্যায় পড়েছি বলতে পারো !

—একটু বুঝিয়ে বলুন।

—তোমাদের চাকরি, তোমাদের উন্নতি, তোমাদের নিয়েই তো সরকারের মাতামাতি।

—সরকার যতই চেষ্টা করুক নিলয়দা, সমাজ যতক্ষণ পর্যন্ত সমাধান না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্যা, সমস্যাই থেকে যাবে সমাধান হবে না।

—কি যে বাজে কথা বলছো।

—উষা খুব একটা বাজে কথা বলে না নিলয়দা, দেখুন না যুবকরা লেখাপড়া শিখে চাকরি পেলে ; মার্কেটে তাদের ডিমাণ্ড বেড়ে যায়। তখন তারা মার্কেটে এসেন্‌সিয়াল কমোডিটি, আর মেয়েরা যতই লেখাপড়া শিখে চাকরি করুক না কেন, তাদের বাপ-মারা মার্কেটে হাংরী কাস্টমার ছাড়া কিছুই না—

নিলয় সিগারেটের ছাইটা এসট্রেতে ঝাড়তে ঝাড়তে বলল।

—বিয়ে না হওয়া পর্যন্তই। বিয়ের পর যে সব পুরুষই তাদের বৌ এর আঁচলে সাত-পাকে বাঁধা থাকে, আঁচল যে ভাবে ঘুরবে, পুরুষরাও সেভাবে বলদের মত ঘুরে বেড়াবে, এটাও তো সকলের জানা।

উষা একটু হেসে বলল।

—ঘর পচ্ছন্দ হয়েছে ?

—পচ্ছন্দ আবার হবে না, দেখতে তো হবে ঘরটা কে পচ্ছন্দ করেছে ? বেশ সুন্দর নিরিবিলি।

—নিরিবিলি দেখেই তো ঘরটা পচ্ছন্দ করেছি।

—তুমি নিশ্চয় নিবিবিলি পচ্ছন্দ করো, তাই না ?

—আমার কথা বাদ দেন, আপনি একটু ভাবুক তো, তাছাড়া জে. এল, আর.ও. সাহেবদের জন্য নিরিবিলি ঘরেরই দরকার।

—কেন বলতো ?

—কত লোকজন আসবে।

—বুঝেছি, কিন্তু তুমি তো আমাকে ছোটো থেকেই জানো, টাকার উপরে আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই।

—আপনার কথা বলছি না, তবে কারো যদি টাকায় লোভ না থাকে, ভবিষ্যতে যে লোভ হবে না, তার তো কোন মানে নেই।

—লোকের সম্বন্ধে বলতে পারবো না, তবে আমার লোভ কোন দিনই হবে না, একথা একটু জোরের সঙ্গেই বলতে পারি উষা।

উষা একটু হেসে বলল—টাকা মাটি, মাটি টাকা এই তো !

—নিলয় একটু হাসলো, একটু চুপ থেকে উষা বলল—উঠি নিলয়দা।

—সেকি ! একটু বসো, চা করি।

—থাক্ থাক্ হাত পুড়িয়ে চা করতে হবে না। তাছাড়া আমি বড় একটা চা খাইও না।

—আগে তো খুব চা খেতে।

—আগে ছোটো ছিলাম বুঝতে পারতাম না, চা এর ক্ষতিটা।

—আচ্ছা উষা। তোমাদের সঙ্গে কতদিন পর দেখা হলো ?

উষা যেন একটু হিসেব করে বলল—

—তা প্রায় আট বৎসর পর।

—প্রথম তোমাকে দেখে কিন্তু চিনতে পারিনি।

—আমি কিন্তু ঠিক চিনেছিলাম।

—একটু নীরব থেকে উষা বলল—আচ্ছা নিলয়দা, কুচবিহারে এখন পাণিফল পাওয়া যায় ?

—পাণিফলের কথা তো বেশ মনে রেখেছো দেখছি !

—মনে থাকবে না, একবার পাণিফলের জন্য কাকাবাবু আপনাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন যে।

নিলয় হো হো করে হেসে ফেললো, তারপর বলল—

—সত্যি উষা, ছোটো বেলার কথাগুলো মনে পড়লে খুব দুঃখ হয় কিন্তু !

—ছোটো বেলায় মানুষের চিন্তা থাকে না তো, বোধ হয় সেজন্যই।

—ছোটো বেলায় কিন্তু আমি তোমার পিছনে খুব লেগে থাকতাম, মনে পড়ে ?

—তার জন্য কাকাবাবুর কাছ থেকে আপনি কি পেতেন ?

—বাবা কিন্তু তোমাকে খুব ভাল বাসতেন উষা !

—সত্যি আজ যদি কাকাবাবু বেঁচে থাকতেন !

নিলয় এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। উষা বলল—

—এর আগে আপনি মালদায় আসেন নি ?

—একবার বোধ হয় ছোটো বেলায় বাবার সঙ্গে তোমাদের বাড়ীতেই এসেছিলাম। তখনকার মালদার সঙ্গে এখনকার মালদার তুলনাই হয় না।

—মালদা আপনার কেমন লাগছে ?

—বাব্‌বা ! মন্ত্রীর জেলা, Top most of the state

—সত্যি মন্ত্রীর চেষ্টাতেই মালদা সহরের উন্নতি এ স্বীকার করতেই হবে।

এবার নিলয় যেন একটু ব্যস্ত হয়ে বলল—

—অনেক্ষণ কথা হচ্ছে, একটু কিছু না হলে চলে না, বসো।

—থাক্ থাক্ আপনি বসুন তো। মিষ্টি খাবার দিন কি চলে গেছে। চাকরিতে join করুন, বিয়ে থা করুন। তারপর মিষ্টিতো আছেই।

—কিন্তু বিয়ে করলে তো আর মিষ্টি খাবার কথা বলতে পারবো না।

—কেন ?

—তখন কি আর বাড়ীর মালিক আমি থাকবো ? দাদা কে তো দেখছি, বেতনের টাকার কড়া ক্রান্তি হিসেবে দিতে হয়। আমরা হাসতে হাসতে মরে যাই।

উষা একটু হাসলো।

নিলয় বললো—ঘরে বিস্কুট আছে, দি কয়েকটা ?

—বিস্কুট ! আমি কি ছোটো ছেলে ?

—বিস্কুট কি ছোটো ছেলেরাই খায় ?

—বিস্কুট হলো অফিসারদের খানা, আমরা গৃহস্থ পরিবারের মানুষ। আমাদের পেট ভরে শাক্-ভাত, কুর্তি-কলাইতে।

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর নিলয় বলল—

—আজ আমার মনটা খুব খারাপ করছে উষা !

—কেন, আজ তো আপনার আনন্দের দিন। লোক চাকরির জন্য হা হা করছে, আর আপনি নতুন-চাকরিতে join করতে গিয়ে দুঃখ করছেন। দুঃখের কি আছে ?

নিলয় একটু গম্ভীর হয়ে বলল।

—জানো উষা, আমি রীতিমত পরীক্ষায় পাশ করে চাকরিতে সেলেক্ট হয়েছিলাম। সে প্রায় ছয় মাস আগে কিন্তু এ্যাপোয়েন্টমেন্ট দিচ্ছিল না।

—কেন ?

—পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা দিতে হবে দুই হাজার টাকা।

—তাই নাকি ?

—বলছি কি, বাবা যা জমিয়েছিলেন, বোনদের বিয়ে দিতেই তো সব টাকা শেষ, তাছাড়াও জমিতে হাত দিতে হয়েছিল। বাবা মরার পর দাদারা নিজের নিজের বৌ নিয়ে কেটে পড়লেন, ভাগ্যিস্ আমার বিয়েটা হয়নি।

—আপনার বিয়ে হলে কি হতো ?

—আমার বৌও আমাকে নিয়ে কেটে পড়তো।

—যখন কেটে পড়েনি, তখন আর আফশোষ করে কি হবে ? ও সব বাদ দিন, এখন বলুন তারপরে কি হলো ?

—শেষ পর্যন্ত মা তার শেষ সম্বল নেকলেসটা বিক্রি করে দিলেন। সত্যি উষা মা যখন তার শেষ সম্বলটা গলা থেকে খুলছিলেন। তখন দেখতে পেয়েছিলাম, মার মুখটা। মায়ের চোখ থেকে জল পড়ছিল। আমি আপত্তি তুলেছিলাম, কিন্তু সেদিন তিনি আমার আপত্তি শুনেন নি।

দুঃখের বিষয় কাল আমি সেই চাকরিতে জয়েন করব, অথচ আমার মা আর এ জগতে নেই।

নিলয় চুপ করলো। সিগারেটের ছাইটা ঝাড়তে লাগলো।

বেশ কিছুক্ষণ পর উষা নীরবতা ভাঙ্গলো।

—স্নেহ, মমতা, ভালবাসা নিয়েই তো মানুষ বেঁচে আছে নিলয়দা, অথচ একদিন সবাইকে, তাদের পাতানো সংসার ছেড়ে চলে যেতে হবে, এতে আমার আপনার করার কিছু নেই, এ প্রকৃতির নিয়ম। এবং এও যেন প্রকৃতির নিয়ম যে, মানুষ যতদিন বাঁচবে ততদিন শোক দুঃখের বোঝা তাকে বহন করতেই হবে, তার ফলেই একজনের মৃত্যু আর একজনের শোকের হেতু হয়ে দাঁড়ায়।

নিলয় আর এ-প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর উষা বলল—চলি।

নিলয়কে যেন একটু ভারাক্রান্ত দেখালো। নিলয় সংক্ষেপে বলল—এসো।

২

উষা বেরিয়ে যেতেই নিলয় একদৃষ্টে উষার দিকে তাকিয়ে থাকলো। উষা আড়াল হতেই, নিলয় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবলো। —'উষাকে কত ছোটো দেখেছিলাম, উষাকে এখন ভাবাই যায় না।'

উষার পথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, এমন সময় দরজার বাহির থেকে ডাক শোনা গেল—নিলয় আছো কি?

স্বরটা যেন পরিচিত বলে নিলয়ের মনে হলো।

—কে এ?—আরে দীপ্তেন্দুদা যে, আপনি কোত্থেকে?

—তুমি জানো না, আমার তো মালদাই পোষ্টিং।

—কলকাতায় ছিলেন না?

—হ্যাঁ, প্রমোশন পেয়ে বছর খানেক হতে চলল, মালদায়

এসেছি।

—বৌদিরা কোথায়?

—বৌদি আবার কোথায় থাকবে?

—আমার খবর কি করে জানলেন?

—আজ তোমার অফিস গেছিলাম যে।

—কেন?

—এই ভদ্রলোকের একটা কাজ নিয়ে।

নিলয় ভদ্রলোকটির দিকে তাকালো। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা গায়ের রং ময়লা শ্যাম বর্ণ। পরনে কোট প্যাণ্ট। চোখে চশমা। বেশ আভিজাত ঘরের ছেলে বলেই নিলয়ের মনে হল। নিলয় বললো—ইনি কে?

—আমাদের বাড়ীওয়ালা, হুমায়ূন মিঞা।

নিলয় হুমায়ুন মিঞার দিকে তাকালো

—নমস্কার বসুন।

হুমায়ুন সাহেব হাসতে হাসতে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। অতঃপর নিলয় বলল—

—আমি তো এখন পর্যন্ত জয়েন করিনি।

—তা শুনেছি

—কে বলল?

—ভট্টাচার্য সাহেব, ওঁনার সঙ্গে এ ভদ্রলোক নাকি যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু আজ বললেন—তিনি আজ এর কাজ আর করতে পারবেন না। আগামীকাল চার্জ নিয়ে বদলি হয়ে যাচ্ছেন। নতুন কে জয়েন করছেন জিজ্ঞাসা করায় বললেন, কুচবিহার থেকে নিলয় গাঙ্গুলী আসছেন! ভাবলাম তাহলে কি আমাদের নিলয় গাঙ্গুলী নাকি! হয়েও গেল তাই।

—কিন্তু ঠিকানা জানলেন কি করে,

—ভেবেছিলাম হয়তো তুমি শঙ্কর কাকাদের বাড়ীতেই উঠেছো,

সেখানে যেতেই মাসীমা এ বাড়ীটা দেখিয়ে দিলেন। নিলয় হাসতে হাসতে বলল—হ্যাঁ, ওঁরাই বাসাটা ঠিক করে দিয়েছেন। একটু চা করি ?

—কে করবে চা ?

—আমিই করবো।

—রান্না করতে শিখেছো নাকি ?

—রান্না করতে পারি না, তবে চা-টা তৈরী করতে পারি।

—বিয়ে থা তো করোনি ?

—না, না, এতো দিনে চাকরি পেলাম। বিয়ের কথা এখনও ভাবিনি।

—একটু রান্না বান্না শিখে নিও।

—কেন ?

—আহা ! তোমরা হলে টুরিং ষ্টাফ। হয়তো সকাল আটটার মধ্যেই কোন কোন দিন বাইরে বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু বাঙালির ছেলে বাবা, দুটো ভাত না খেলে তো পেটটাই ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। আটটার সময় তো আর হোটেলে ভাত পাবে না। তুমি কি ভাবছো, সকাল আটটার মধ্যে বৌ তোমাকে ভাত রান্না করে দেবে ?

—কেন দেবে না ?

—আরে ভাই আজকাল B. A. পাশ না করিয়ে তো কেউ তার মেয়ে দিয়ে দিচ্ছে না। আর B. A. পাশ বৌ তোমাকে তো আর সকাল আটটার মধ্যে ভাত রান্না করে দেবে না, ঘুম থেকে উঠবেই তো সকাল আটটায়। ভুগতে হচ্ছে ভাই।

—তাই নাকি ?

—লজ্জা লাগছে বলতে, আর না বলেও থাকতে পারছি না। শোনো, আমি ভোরে উঠে চা করি, আগে এককাপ চা বৌকে বিছানায় দিয়ে, তারপর আমি চা মুখে দি। আবার কোন দিন চায়ে মিষ্টি কম হয়ে গেলে দৌড়তে দৌড়তে চায়ে চিনি দিয়ে চামচ দিয়ে

ঘেঁটে দিতে হয়। বৌ বিছানায় শুয়ে শুয়ে চা খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। আমি কাপ টাপ ধুয়ে, উনুনে আঁচ দিই, তরকারি কুটি, উনুনে আঁচ না উঠলে বাতাস করতে হয়, এই দেখো ভাই। কথাটা বলেই দীপ্তেন্দুবাবু তার কপাল দেখালেন।—পুড়ে গেছে।

—কপাল কি করে পুড়লো ?

—আজকাল ভাই যা কয়লা বেরিয়েছে, ফটাস ফটাস করে এমন ফুটতে আরম্ভ করে, যেন বোম ফাটছে।

—বৌদিকে কিছু বলেন না ?

—চাকরি করা বৌকে কিছু বলে কি ঘরে অশান্তি করবো। তখন হয়তো খাবেই না। আবার খাবার জন্যে আমাকেই হাতে পায়ে ধরতে হবে। আর আমার তো ভাই Bank-এর কাজ, ঠিক দশটায় পৌছাতে হয়।

—কিন্তু আপনার যে কপাল পুড়লো ?

—তা পুড়ুক, রাত্রে বৌ মলম লাগিয়ে দেয় এটাই আনন্দ। নিলয় হাসতে হাসতে বলল—বলুন এ ভদ্রলোকের কি কাজ ?

দীপ্তেন্দু বাবু বলতে আরম্ভ করলেন,

—ইনি এবার একটা ব্রিক ফিল্ড করবেন মনস্থ করেছেন।

—ব্রিক ফিল্ড! সে আবার কি জিনিষ ?

—একটা বড় ইঁটের ভাঁটা, ইটের বিজ্‌নেস করবেন।

—বেশ তো ভাল কথা, করুন, আমাদের যখন ইটের দরকার পড়বে সেখান থেকেই নেবো।

—তা তোমার যত ইটের দরকার লাগবে নেবে, কিন্তু তার তো একটা পারমিটের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

—কিন্তু পারমিট কি আমরা দেবো ?

—তোমরা দেবে না, পারমিট দেবেন A.D.M. সাহেব। কিন্তু নিয়ম হলো, ভাঁটা যে এলাকায় হবে। সেই এলাকার জে. এল.

আর. ও সাহেবের রেকম্যাণ্ডশন লাগবে, তাই মাইনস্ এণ্ড মিনারেলের রুলে আছে। ঐ রুলের কুয়েরীগুলো, জে, এল-আরও তার রিপোর্টে ফিল আপ করবেন।

—বেশ তো কাল জয়েন করি। পরশু করে দেবো।

—পরশু করলে চলবে না নিলয়, এটা তোমাকে কালকেই করতে হবে।

—এতো তাড়াতাড়ি!

—তোমাকে কথাটা খুলে বলি, একলাখ টাকা লোন sanction করতে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বা এজেন্টরা পারেন না, শুধু রেকম্যাণ্ড করতে পারেন। Sanctioned হয় কলকাতা Head Office থেকে। আগামী পরশু আমি কলকাতায় যাচ্ছি তো, হাতে হাতে sanction করিয়ে আনবে ভাবছি। বাড়ীওয়ালা তো, ওঁর হয়ে একটু খেটেদি।

—তা হলে ওদিককার কাজটা, সেরে আসুন না হয়।

—তুমি বুঝতে পারোনি, পারমিট নম্বর সহ, পারমিটের এক কপি না হলে তো লোন দেবে না। ইনডাষ্ট্রি করছে, ব্যাঙ্ক কি করে রিলাই করবে।

নিলয় এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর হুমায়ুন মিঞা বললেন—আমি স্যার উপরে ঠিক করে এসেছি, আপনার রিপোর্ট গেলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে পারমিট বের করে নেবো।

—আচ্ছা ঠিক আছে।

—তা হলে আসি নিলয়!

—আর একদিন সময় করে আসবেন।

—ঠিক আছে, তুমিও একদিন যেও।

—ভাবছিলাম বৌদির হাতের রান্না একদিন খাবো, কিন্তু আপনি যা শোনালেন!

—আহা ভাবছো কেন, এখন বৌয়ের চেয়ে আমিই ভাল রান্না করতে পারি। এখন তরকারীতে লবণ দেওয়ার সময় আমাকেই বৌ ডাকে।

নিলয় হাসতে লাগলো।

দীপ্তেন্দুবাবু বেরিয়ে যেতেই, হুমায়ুন সাহেব নিজের পকেট থেকে একটা পঁচিশ টাকার বাণ্ডিল টেবিলের উপর রেখে বললেন —স্যার, বাঁকি পাঁচশ কাল দিয়ে যাব।

—একি করছেন মশায়, টাকা নিয়ে যান।

—এটা স্যার আপনার মিষ্টি খাবার জন্য।

—বলছি এটা তুলে নিন বেশ জোরের সাথে বলল নিলয় গাঙ্গুলী। হুমায়ুন সাহেব হকচকিয়ে টাকাটা তুলে নিলো ; বললো —না, স্যার ওভাবে বলিনি।

৩

নিলয়ের বাসা থেকে উষা যখন বাড়ী ফিরলো তখন সন্ধ্যা প্রায় সাতটা।

ঘরে ঢুকেই উষা শুনতে পেল তার বাবার কণ্ঠস্বর।

—উষা এখনও বাড়ী ফিরলো না যে, কোথাও পাঠিয়েছো নাকি?

—নিলয়ের ওখানে গেছে বোধ হয়।

কথাটা বলেই সরমা কি একটা কাজে রান্না ঘরের দিকে পা বাড়াতেই দুর্গাশঙ্কর বাবু বললেন।

—সরমা, মেয়ে বড় হলে বাপ মার যে কি চিন্তা হয় এতদিনে বুঝতে পারছি। উষার বিয়ে দিতে না পারলে হয়তো শান্তিতে মরতে পারবো না।

—আমি কিন্তু নিলয় কে টারগেট করে রেখেছি; তুমি কি বলো?

—কিন্তু টাকার তো দরকার।

—নিলয় কিন্তু ডিমাণ্ড করবে না।

—তুমি কি করে বুঝলে?

—এমনিতে নিলয় বলে টাকা মাটি, মাটি টাকা। এখন চাকরিও পেল।

—সবই বুঝলাম সরমা, আমি বিশ বছর উকিলি করলাম, আমি তো বুঝতে পারি। জে.এল.আর.ও. মানেই জমিদার, যখন বড় বড় ধনপতি তাদের মেয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যাবে তখন কি নিলয় আমাদের দিকে আর তাকাবে?

—কিন্তু আমার মেয়ে কি তার অযোগ্যা, দেখতে সুন্দরীই তো লোকে বলে, গুণও যথেষ্ট, লেখাপড়াও করেছে। ইংরেজিতে Hons. নিয়ে কয়জন B. A. পাশ করে? দেখছো না, সামান্য কটা টাকাতে কি ভাবে সংসার চালিয়ে নিচ্ছে?

—সরমা, দু-হাতে হাজার হাজার টাকা রোজগার করেছি, তখন কি আর ভাবতে পেরেছিলাম, আমার এ অবস্থা হবে। তিন বছর ধরে প্যারালিসিস হয়ে পড়ে আছি, একটা পয়সা রোজগার করতে পারি না। কোর্টে না বেরুলে তো কেউ টাকা দেবে না। বিপ্লব তিন শ টাকা করে মাসে পাঠায়। তার মধ্যেই উষাকে সংসার চালাতে হয়। সংসারটাই পড়েছে উষার ঘাড়ে, আমার ঐটুকু মেয়ের কি আর ওসব করার বয়েস। প্রাণ যেন আমার ফেটে যাচ্ছে। অর্থের অভাবে মেয়েটার বিয়ে দিতে যদি না পারি, তবে বোধ হয় শান্তিতে মরতেও পারবো না।

—তুমি ওসব চিন্তা করোনা তো, ঠাকুরের উপর ভরসা রাখ তিনিই সব বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

কথাটি বলেই সরমা রান্না ঘরের দিকে পা বাড়াতেই, উষা আড়াল থেকে সরে গেল, উষাকে দেখেই সরমা বললেন—কি রে,